মণিকর্ণার মতো কত নদীই যে শুকিয়ে গেল

জয়া মিত্র

সাঁইথিয়া থেকে গাড়িতে যাচ্ছিলাম রামপুরহাটের দিকে। জ্যৈষ্ঠ মাস। আকাশে তীক্ষ্ণ রোদ, কিন্তু চারপাশে মাঠ বোরোধানে সবুজে সবুজ। মনে হচ্ছে বীরভূম নয়, বর্ধমান জেলা যেন। মিনিট পনেরো কি আধঘন্টার মাথায় হঠাৎ ডানদিকে একটা রেলব্রিজ। দিব্যি সেই পুরনো কালের খিলানওলা লাল ইটের মাঝারি সাইজ ব্রিজ। বাঁদিকে পুরনো বাস রাস্তার উপরেও দেখি তাই। অথচ জায়গাটা ধানখেত। খেতের মাঝখানের রাস্তা দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে। অবাক হয়ে ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করি, "এই ব্রিজগুলি কেন? এখান দিয়ে কি জল যেত?" সে বলে ওটা একটা নদী। নামও বলে 'মণিকর্ণা।' এত সহজভাবে বলে যে, মনে হয় যেন জীবিত, পরিচিত নদী কোনও। অথচ চোখের সামনে তার কোনও চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। ড্রাইভার মানুষটি ভাল, সে ধৈর্য ধরে আমার নানা হাবিজাবি প্রশ্নের জবাব দিয়ে যায়। পরে আরও একে-তাকে শুধিয়ে আরও কিছু খবরও জানা যায়। মণিকর্ণা ময়ূরাক্ষীর উপনদী। ময়ূরাক্ষীর বুকে যে বালি জমে গিয়েছে তার ফলে মণিকর্ণার জল আর সহজে সে নদীতে ঢুকতে পারে না। জল অনেক বাড়লে তবেই কেবল ময়ূরাক্ষীর উঁচু হয়ে ওঠা খাতে মণিকর্ণার জল ঢুকতে পারত। ফলে সারা বছর জলের সঙ্গে আসা বালি বসে যায় নদীর বুকেই। মণিকর্ণা নদীরও খাত বয়ে আসা বালিতে বুজে যেতে যেতে মাঠের সমান হয়ে যায়। স্রোত যায় শুকিয়ে। আর দু'পাশের চাষের খেত ধীরে ধীরে বড় হয়ে যায়। নেমে আসতে থাকে নদীর মধ্যে। কিন্তু বর্ষাকালে পুরো অববাহিকা ধরে নদীর জল তো নামবেই। অথচ মণিকর্ণা বা ময়ূরাক্ষী কিংবা ময়ূরাক্ষী যেখানে এসে মিশেছে, সেই অজয়, কারও খাত নেই বলে সে-জল দ্রুত বয়ে যেতে পারে না। সমস্ত এলাকাটা ধরে ছড়িয়ে পড়ে আর খুব ধীরে ধীরে নামে। বর্ষা যত বাড়ে জমা জলের পরিমাণও বাড়ে, আবার বাড়তে থাকে জল নামার সময়। ফলে এই সব প্রাক্তন নদীখাত, যারা এখন ধান খেত, সেগুলি পাঁচ ফুট পর্যন্ত জলের তলায় ডুবে থাকে। কতদিন? দু'মাস হতে পারে। তার বেশিও হয়।

"এই ধানের কী হয় তখন?"

"জল যদি আগে এসে যায় তখন কেটে তোলা যায় না, পচে যায়।"

"পচে যাবে জেনেও চাষ করে কেন লোকে?"

"প্রতি বছর তো ডোবে না। আশায় আশায় করে।"

আরও কত জায়গায় আজকাল চাষ হয় আশায় আশায়? রেললাইনের ধারে টানা লম্বা খালের মতো নিচু জমি থাকত। তাকে বলত নয়ানজুলি। উঁচু করে রেললাইন তৈরির জন্য মাটি কাটার দরুন নয়ানজুলি তৈরি হয়। অনেকখানি জল জমে থাকত এগুলির মধ্যে বছরের অন্তত ছ-আট মাস ধরে। এমনকি, চৈত্র-বৈশাখে টানের দিনে নয়ানজুলির ধারের কলমি শাক কি

তলানি কাদা হাঁটকে ল্যাটা মাছ, চ্যাং, গড়ুই, গুগলি-শামুক তুলছে মেয়েরা-বাচ্চারা, ট্রেনের জানলায় এটা বেশ পরিচিত দৃশ্য ছিল। গত আট-দশ বছরে এই নয়ানজুলিগুলি অদৃশ্য হয়ে গেল। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগে বর্ধমান-মেদিনীপুর-নদিয়া-উত্তর ও দক্ষিণ-চব্বিশ পরগনার গ্রামে গ্রামে অজস্র ডোবা, পুকুর ছাড়াও প্রতি বাড়িতে একটা 'পগার' থাকত। সেটাই সাধারণত গৃহস্থের সীমানা। সেখানে গৃহস্থালির নানারকম আবর্জনা ছাড়াও বেশ কাদাকাদা গোছের জল থাকত। আটের দশক থেকে, যখন থেকে উচ্চফলনশীল ধানচাষ শুরু হল, ধানের সমস্ত বাস্তব মূল্যের বদলে ধানের দাম হয়ে দাঁড়াল কেবল নগদ টাকা, সেই সময় থেকে এই পগারগুলি ধীরে ধীরে ধানজমি হয়ে যেতে লাগল। হয়তো দশ-কুড়ি ফুট জায়গা, যেখানে ফলন্ত ধানের পরিমাণ খরচ ও টাকার আনুপাতিক হিসাব করলে নিতান্ত নগণ্য, কিন্তু সমস্ত গ্রামে ওই পগারগুলিতে যতখানি করে বৃষ্টির জল ধরা থাকত, তার মোট পরিমাণ সামান্য নয়। আজ যখন সরকারি তরফ থেকে চাষের জমির এক-ষষ্ঠাংশে, ট্রেঞ্চ কেটে রেখে 'রেন ওয়াটার হারভেস্টিং'-এর উপায় এবং 'গ্রাউন্ড ওয়াটার রিচার্জিং' গ্রামের লোককে শেখানোর জন্য বহু চেষ্টা ও উদ্যোগ নেওয়া হয়, পগারের ভূতগুলি নিশ্চয়ই অবশিষ্ট গাছকটার মাথায় বসে হাসে।

কয়েক কেজি কি দুই-একমণ ধান বেশি ফলানোর লোভে আমরা মাটি ও জলের বিশিষ্ট সম্পর্ককে অজস্র দিক দিয়ে আঘাত করে চলেছি। তার ফলাফল সারা বছর লাভ বই লোকসান বলে নজরে আসে না, যতক্ষণ না তিনদিনের বৃষ্টিতে ত্রিশ লক্ষ মানুষের ভিটেবাড়ি গৃহপালিত পশু-গৃহস্থালি-এমনকি প্রাণ বিপন্ন হয়। এমনকি চূড়ান্ত বিপর্যয়ের মুহূর্তেও প্রশ্ন আবর্তিত হয় কেবল ত্রাণ ও ত্রাণবন্টন নিয়ে, বন্যার কারণ হিসাবে ভাসা-ভাসা গালগল্প ছাড়া কিছু শোনা যায় না। যাঁরা প্রতি বছর এই বীভৎস অবস্থার মুখে পড়েন, প্রতি বছর যাঁদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ, অভিজ্ঞতার তিক্ততা বাড়তেই থাকে, তাঁদের কথা শোনার কান কমে।

বন্যা এ-দেশে চিরকাল হত। গাঙ্গেয় বন্যার পলি দিয়ে এই বাংলাদেশ গঠিত। সেই মাটির বিপুল উর্বরতাই একে সোনার বাংলা নাম এনে দিয়েছিল। সমস্ত নদী-মাতৃক দেশের মতোই এ-দেশের মানুষও হাজার হাজার বছর ধরে বন্যার সেই স্বাভাবিকতার সঙ্গে বাস করার কৌশল আয়ত্ত করেছিলেন। কেবল যেমন তেমনভাবে বাস করা নয়, যে বর্ষা প্রতি বছর দিন তারিখের নিয়ম মেনে আসে, যে গ্রীষ্মতাপের বাড়া কমার নির্দিষ্ট তিথি হিসাব করা আছে, সেই গ্রীষ্ম-বর্ষা-হেমন্তের ঋতু চক্রের সঙ্গে নিজেদের উৎপাদনের চক্রকে সবচেয়ে সুবিধাজনকভাবে মিলিয়ে নিয়েছিলেন। দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানে যেমন সমুদ্রতীরে বাস-করা জেলেরা জানেন, কোন বিশেষ সমুদ্রস্রোতটি দিনের কোন সময়ে একটি নির্দিষ্ট পথে যায়, সেই মতো তাঁরা নৌকা চালনা করেন বা বন্ধ রাখেন প্রকৃতির কাছাকাছি বাস-করা প্রত্যেক মানুষকে এটা জানতে হয়। সুস্থ সহজভাবে বেঁচে থাকার জন্য, সুষ্ঠুভাবে কাজ করে যাওয়ার জন্য। জ্ঞানের এই অকল্পনীয় বিশাল ভাণ্ডারকে অবহেলা করলে, প্রাকৃতিক নিয়মগুলির বিরুদ্ধাচরণ করলে মানুষ নিজেকে কোন সর্বনাশে নিয়ে আসে 'গ্লোবাল ওয়ার্মিং' বা বর্ষাকাল শুরু হওয়ার আগেই বন্যায় সর্বস্বান্ত লক্ষ লক্ষ মানুষ তার সাবধান-সঙ্কেত।

সৌজন্যে : সংবাদ প্রতিদিন, ৩.৭.০৮